বিষাক্ত ইতিহাসঃ ভারতের চিপ উৎপাদনের পরিকল্পনা ও কর্মস্থলে নিরাপত্তা

জাসুন শেলাত

৯ ডিসেম্বর, ২০২৪

সেমি-কন্ডাক্টর শিল্প নিয়ে ভারত কিছু বড় বড় পরিকল্পনা করছে। তাইওয়ান, দক্ষিণ কোরিয়া ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্যময় চিপ উৎপাদনের এই পৃথিবীতে ভারত সদ্য প্রবেশ করেছে। এই ক্ষেত্রে গত কয়েক বছর ধরে বিনিয়োগের জন্য ভারত যে রকম উদ্যম নিয়েছে, তা আগে কখনও ঘটতে দেখা যায় নি। ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের একটি অনুষ্ঠানে ভারতের প্রধানঅমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, "আমাদের স্বপ্ন হল যে একদিন বিশ্বের প্রতিটি যন্ত্রে ভারতে নির্মিত চিপ ব্যবহার করা হবে।" সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইন্ডিয়া সেমি-কন্ডাক্টর মিশনের অংশ হিসেবে নতুন দিল্লী এই ক্ষেত্রে ৭৬,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছে এবং যে সংগঠনগুলি ভারতে চিপ উৎপাদন করবে সেগুলিকে বিশাল পরিমাণে ভর্তুকি দেওয়া হবে। এই ভাবে, ২০২৩ সালে যে শিল্পের মূল্য ছিল ২৯ বিলিয়ন ডলার, ভারত আশা রাখে যে, ২০৩০ সালের মধ্যে তা চারগুণ বেড়ে ১০৯ বিলিয়ন হবে।

এই রকম সুবৃহৎ সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে কিছু জরুরী প্রশ্নও উঠে আসে। সরকার যেমন দাবি করেছে, সরকারি বিনিয়োগ কি সত্যিই সেই পরিমাণে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবে? কিন্তু, এই শিল্পক্ষেত্রে ভারতের প্রথম পদক্ষেপ নিয়ে ঘোষিত শিরনামের ভিড়ে যে বিষয়টি পুরোপুরি হারিয়ে যাচ্ছে সেটি হল, ভারতীয় কর্মীদের কাছে এই পদক্ষপের অর্থ কী দাঁড়াবে?

বিশেষ করে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার দিক থেকে ভারতের উৎপাদন শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রম আইনের পরিকাঠামো, আগে থেকেই যথেষ্ট হতাশাজনক। অন্যান্য উৎপাদনকারী দেশ ও শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা নিয়ে গবেষণা থেকে জানা যায় যে, চিপ-উৎপাদনের জন্য যে তীব্র রাসায়নিক প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়, তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকারক। একই সঙ্গে, সরকারের পক্ষ থেকে কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত শ্রম আইনগুলিকে আইনবদ্ধ করার চেষ্টা চলছে এবং এই প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য হল, রাসায়নিক ও বিষাক্ত পদার্থ ব্যবহারের সীমা নির্দেশকারী নিয়ন্ত্রক বিধিগুলিকে উঠিয়ে দেওয়া। কিন্তু এই শূন্যস্থানকে পূরণ করার জন্য প্রয়োজনীয় সতর্কতা বা পরিদর্শনের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য কোনও বিকল্প তৈরির কোনও প্রতিশ্রুতিও সরকারের দিক থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। শক্তিশালী নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি চালু না করে বা কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত যে আইনগুলি আগে থেকেই আছে, সেগুলিতে অনুকূল পরিবর্তন না এনে ভারতে চিপ-উৎপাদন শিল্পের অতিদ্রুত বিকাশের এই প্রচেষ্টা ভবিষ্যতে এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত কর্মীদের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে।

বিষাক্ত ইতিহাস

সেমি-কন্ডাক্টরের নির্মাণের জন্য তীব্র রাসায়নিকের ব্যবহার হয় ও এমন সব জটিল প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয় যা, একটি চিপে কতগুলি স্তর থাকবে তার উপর ভিত্তি করে, একশ বার পর্যন্ত পুনরাবৃত্ত হয়। উৎপাদনের জন্য ঠিক কি উপাদানের ব্যবহার হয়, তার বিষয়ে তথ্য এই শিল্প গোপন রাখে। শিল্পের শুরুর দিকে, অর্থাৎ ষাটের দশক থেকে নব্বইয়ের দশক পর্যন্ত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র চিপ-উৎপাদনে নেতৃস্থানীয় ছিল ও সব চেয়ে বেশি সংখ্যক কর্মী এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এই কর্মীরা ওই কয়েক বছরে চিপ নির্মাণের সময় যে রাসায়নিকগুলি নিয়ে কাজ করেছেন, তার অনেকগুলিই ক্যান্সার,প্রজনন-স্বাস্থ্যে সমস্যা ও উচ্চহারে গর্ভপাতের কারণ হিসেবে ধরা পড়েছে। ১৯৮০-র দশকে ক্যালিফোর্নিয়াতে পরিচালিত একটি গবেষণায় দেখা গেছে যে, চিপ-উৎপাদনকারী শ্রমিকদের মধ্যে কর্মক্ষেত্র থেকে উদ্ভুত অসুস্থতার হার অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের থেকে তুলনামূলকভাবে অনেকটাই বেশি। ওই রাষ্ট্রের ডিপার্টমেন্ট অফ ইনডাস্ট্রিয়াল রিলেশন থেকে যে তথ্য পাওয়া যায়, তা থেকে জানা যায় যে, ১৯৭৮ সালে চিপ নির্মাণকারী শ্রমিকদের অসুস্থতার হার অন্যান্য শিল্পের কর্মীদের থেকে চারগুণ বেশি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

১৯৯০-এর দশক নাগাদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সেমি-কন্ডাক্টর নির্মাণের সঙ্গে জড়িত স্বাস্থ্যহানির বিষয়ে আরও অনেক তথ্য বেরিয়ে আসে। ১৯৯২ সালে, আইবিএম-এর বরাত দেওয়া একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, ইথিলিন গ্লাইকল ইথারস (ইজিইএস)-এর মত বেশ কয়েকটি রাসায়নিক, সেগুলি নিয়ে কাজও করেন এমন কর্মীদের মধ্যে গর্ভপাতের অত্যন্ত উচ্চহারের কারণ এবং এর পরেই ওই সংগঠন ধীরে ধীরে এই রাসায়নিকগুলির ব্যবহার বন্ধ করে দেয়। একই বছর, সেমি-কন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি অ্যাসোসিয়েশনের থেকে বরাত দেওয়া একটি সমীক্ষা মহিলাকর্মীদের মধ্যে স্বেচ্ছায় গর্ভপাতের উচ্চহারকে চিহ্নিত করে এবং দেখায় যে, যে মহিলারা চিপের বিভিন্ন অংশ জোড়ার কাজ করেন তাঁদের মধ্যে ওই হার আরও বেশি।

এই সময়ই, যে কর্মীরা ক্যান্সার, দীর্ঘস্থায়ী ব্যাধি ও প্রজননকেন্দ্রিক স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে প্রতিকূল প্রভাবে ভুগছেন, তাঁরা বেশ কিছু সেমি-কন্ডাক্টর নির্মাণকারী সংগঠনের বিরুদ্ধে মামলা করেন, যার মধ্যেই অনেক মামলাই আদালতের বাইরে মিটিয়ে নেওয়া হয়। ২০০৬ সালে একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে, ১৯৬৯ সাল থেকে ২০০১ সালের মধ্যে আইবিএম-এ কাজ করেছেন এমন প্রায় ৩২০০০ কর্মীদের মধ্যে যত মানুষ ক্যান্সারে (মস্তিষ্ক, মূত্রগ্রন্থি ও চর্ম সহ) ভুগছেন, তার হার সাধারণ জনতার থেকে অনেকটাই বেশি। এই সংগঠনের বিরুদ্ধে যখন দুজন কর্মী মামলা দায়ের করেন তখন বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণের জন্য প্রকাশিত তথ্য থেকে এই বিষয়টি জনসমক্ষে আসে।

যখন চিপ-নির্মাণ শিল্প তাদের উৎপাদনের কাজ এশিয়াতে নিয়ে যায়, তখন সেখানকার কর্মীরা স্বাস্থ্যের দিক থেকে একই রকম বিপদের মুখোমুখি হন। গবেষণা থেকে জানা যায় যে, চিপ নির্মাণের জন্য যে রাসায়নিকগুলির ব্যবহার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "ধীরে ধীরে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল" দক্ষিণ কোরিয়ায় সেই একই রাসায়নিকের সঙ্গে সঙ্গে, যে রাসায়নিকগুলির বিষাক্ততা ও মূল্যায়ন সংক্রান্ত তথ্য সীমিত, সেগুলিকেও ব্যবহার করা হচ্ছিল। চিপ-নির্মাণ কেন্দ্রের কর্মীদের মধ্যে লিউকোমিয়ার পাশাপাশি ক্যান্সার, টিউমার এবং উচ্চহারের গর্ভপাতের ঘটনা দেখা যাচ্ছে। ২০০৭ সালে ওই কর্মীদের পরিবার ও শ্রমের বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে শুরু করা সুদীর্ঘ আইনি লড়াই এবং জনপ্রচারণার পর, অবশেষে ২০১৮ সালে, ভারতের একটি প্রধান সেমি-কন্ডাক্টর উৎপাদনকারী সংস্থা, স্যামসাং ইলেক্ট্রনিক্স, তাদের ত্রুটি স্বীকার করে ও প্রতি মামলাকারী কর্মীকে ১৩৩,০০০ ডলার ক্ষতিপূরণ দিতে স্বীকার করে, যার কারণ হিসেবে এই

সংগঠনটি জানায়, "আমাদের সেমি-কন্ডাক্টর এবং এলসিডি কারখানায় স্বাস্থ্যহানির সম্ভাবনাকে সঠিকভাবে সম্বোধন করতে অক্ষমতা।" চিপ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান ও কর্মীদের প্রতিকূল শারীরিক প্রভাবের মধ্যে কোনও রকম সম্পর্কের সম্ভাবনা এই সংগঠন একেবারেই অস্বীকার করে।

স্বচ্ছতা ও দায়

সাধারণত, মানব শরীরের উপর বিশেষ একটি রাসায়নিকের প্রভাব অভ্রান্তভাবে নির্ণয় করা এপিডেমিওলজিকাল গবেষণার পক্ষে কঠিন। আমাদের হাতে প্রমাণ হিসেবে যা আছে তা হল, যে কর্মীরা পেশাগত কারণে অসুস্থ হয়েছেন, তাঁদের দিক থেকে দায়ের করা মোকদ্দমার ইতিহাস। অনেক সময়ই, এই স্বাস্থ্যহানির জন্য সংগঠনের পক্ষ থেকে কোনও দায় নেওয়ার বদলে এই মামলাগুলিকে আদালতের বাইরে মিটিয়ে নেওয়া হত। ভারতের মত যে দেশগুলি সেমি-কন্ডার নির্মাণশিল্পে দ্রুত উন্নয়নের জন্য যে রকম মারমুখী পন্থা নিয়েছে, সেগুলির এই উদাহরণ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। অন্যান্য দেশে এই শিল্পক্ষেত্রে পেশাগত কারণে স্বাস্থ্যহানির ঘটনাগুলি দুটি বিষয়কে চিহ্নিত করেঃ চিপ-উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিকের বিষয়ে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব ও উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদান বা প্রক্রিয়ার বিষয়ে স্বচ্ছতা বা দায়িত্বের অনুপস্থিতি ।

চিপ তৈরির জন্য ব্যবহৃত রাসায়নিক বা শরীরের উপর তাদের সম্ভাব্য ক্ষতিকর প্রভাবের বিষয়ে কর্মীদের অবহিত করতে অক্ষমতার একটি ইতিহাস আছে এই শিল্পে। প্রযুক্তির অগ্রগতির ফলে এমন অনেক নতুন রাসায়নিকের ব্যবহার শুরু হয়েছে, মানব শরীরে যাদের প্রভাব নিয়ে পর্যাপ্ত মূল্যায়ন হয় নি। উৎপাদনের কাজ যাঁরা করেন তাঁদেরকে পুরো শরীর ঢাকা একটি পোষাক পরতে হওলেও, সেই পোষাকগুলির কাজ মূলত চিপ/সিলিকনের দানাকে দূষিত হওয়া থেকে রক্ষা করা, শ্রমিকদের বিষাক্ত রাসায়নিকের প্রভাব থেকে নিরাপত্তা দেওয়া নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দক্ষিণ কোরিয়ার মত দেশে রাসায়নিকের ব্যবহারে পরিবর্তন আনা বা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা শ্রমিক যৌথের সুদীর্ঘ প্রচারণা ও আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি। অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (ওএসএইচএ) নামে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক সংগঠনটি স্বীকার করে যে, অনেক রাসায়নিকের অনুমোদিত সীমাগুলির বিষয়ে নতুন করে তথ্য সংগ্রহ হয় নি বা সেগুলি উৎপাদন প্রক্রিয়ার দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলে না। সহ্য ক্ষমতার অনুমোদিত সীমার অধিকাংশই জারি হয় ১৯৭০ সালে, যখন পেশাগত স্বাস্থ্য বিষয়ক আইন অকুপেশনাল সেফটি অ্যান্ড হেলথ অ্যাক্ট প্রথম প্রবর্তিত হয়।

ভারতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়

ভারতের পেশাগত ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার উপর নিয়ন্ত্রক প্রক্রিয়ার যে রকম অবস্থা, সেদিক থেকে বিবেচনা করলে, সেমি-কন্ডাক্টর উৎপাদনের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যহানির ইতিহাস ভারতের জন্যও সমস্যা তৈরি করে। সম্প্রতি চালু হওয়া কোড অন অকুপেশনাল হেলথ অ্যান্ড সেফটি, ২০২০ আইনটিতে "বিপজ্জনক" শিল্প নিয়ে একটি তালিকা আছে, যাতে "সেমি-কন্ডাক্টর উৎপাদন শিল্প" জায়গা পেয়েছে। তার ফলে এই শিল্প এমন একটি শর্তের আওতায় পড়ে, যে শর্ত অনুযায়ী তাকে স্বাস্থ্যের জন্য বিপজ্জনক বিষয়গুলিকে প্রকাশ করতে হবে (এস. ৮৪), কর্মীদের স্বাস্থ্যের বিস্তারিত বিবরণসহ নথি রাখতে হবে, ও সঙ্গে সঙ্গে বাধ্যতামূলকভাবে কর্মীদের ডাক্তারি পরীক্ষার ব্যবস্থাও করতে হবে (এস. ৮৫)।

"বিপজ্জনক" তালিকায় এই শিল্পকে যুক্ত করা অবশ্যই একটি অতি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ, কিন্তু পরিতাপের বিষয়, ভোপাল গ্যাস ট্র্যাজেডির পর ১৯৮৭ সালে এই তালিকার শেষবারের মত আধুনিকীকরণ হয়। এমনকি, আগেকার ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট, ১৯৪৮-এর সেকেন্ড শিডিউলেও যার উল্লেখ ছিল সেই রাসায়নিক ও বিষাক্ত উপাদানের "অনুমোদিত সীমা"-র সম্পূর্ণ অনুপস্থিতি এই আইনের একটি বিপজ্জন বিচ্যুতি। সেমি-কন্ডাক্টর শিল্পের বিষাক্ত রাসায়নিকগুলির বিষয়ে আমাদের বর্তমানের জ্ঞান অনুযায়ী আইনটির আধুনিকীকরণের পরিবর্তে যেকোন উপাদানেরই "অনুমোদিত সীমা"-র বিষয়টিকে একেবারে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তার পরিবর্তে যুক্ত হয়েছে "রাজ্যসরকারের দ্বারা নির্ধারিত" অংশটি। কি উপায়ে বা কোন দিক থেকে বিস্তৃত বিবরণীটির আধুনিকীকরণ হবে তার কোনও সংস্থান রাখা হয় নি। এর বিপরীতে, ফ্যাক্টরিজ অ্যাক্ট, ১৯৪৮-এর নিয়ম অনুযায়ী, একমাত্র বিশেষজ্ঞ সংগঠন ও ব্যক্তির থেকে উপযুক্ত প্রমাণ হাতে পাওয়ার পরই কেন্দ্রীয় সরকার সেকেন্ড শিডিউলের অনুমোদিত সীমায় পরিবর্তন আনতে পারত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যেমন ওএসএইচএ, ভারতে সে রকম কোনও নিয়ন্ত্রক সংস্থা নেই যা সহনীয়তার সীমা নির্দেশ করে। এপিডেমিওলজিকাল মান বা পেশাগত ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য নিয়ে এপিডেমিওলজিকাল সমীক্ষা চালানর বা বিকাশের জন্য কোনও সংস্থা বা নিয়ন্ত্রক সংগঠনকে নিযুক্ত করা হয় নি। জাতীয় নীতি তৈরির জন্য যে ডিরেক্টোরেট জেনারেল ফ্যাকট্রি অ্যাডভাইস সার্ভিস অ্যান্ড লেবার ইনস্টিট্যুট (ডিজিএফএএসএলআই) একটি প্রযুক্তিক কাঠামো হিসেবে কাজ করে, সেই সংস্থাটিই কদাচিৎ পেশাগত ক্ষেত্রে স্বাস্থ্যের বিষয়টি নিয়ে সমীক্ষার পরিচালনা করে। পর্যাপ্ত পরিকাঠামো (যেমন গবেষনাগার ও প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি) ও পরিদর্শনের কাজে নিযুক্ত প্রশিক্ষিত কর্মীর অভাব পেশার পরিসরে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি দীর্ঘকালীন সমস্যা।

ভারতের প্রধান রাজ্যগুলির সমস্ত শ্রম আইনের ক্ষেত্রে পরিদর্শনের হারে একটি অবিচলিত পতন দেখা গেছে। আইনটি এমন একটি পরিদর্শন পরিকল্পনার প্রচলন করেছে যা "ওয়েব ভিত্তিক পরিদর্শন"-এর উপর, অর্থাৎ এই আইনের অন্তর্গত তথ্যগুলিকে ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সন্ধান করা যায়, এবং এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিদর্শনের জন্য নির্বাচিত কারখানাগুলিকে এলোমেলোভাবে সাজান থাকবে ও উৎপাদনে ব্যবহৃত উপাদান বা নির্মাণ প্রক্রিয়া পরিদর্শন করার জন্য পরিদর্শকরা নিজে কারখানা চিহ্নিত করতে বা সেগুলিতে প্রবেশ করতে পারবেন না। ভারতের অনেক রাজ্যই স্ব-শংসাপত্র দেওয়ার পন্থা গ্রহণ করেছে, বা পরিদর্শকের উপস্থিতিতে যে কোনও পরিষদের অধীনস্থ কারখানাকেই পরিদর্শন থেকে অব্যাহতি দিয়ে দিয়েছে। এর আগে, শ্রমিক প্রতিনিধিসহ একটি নিরাপত্তা সমিতির প্রতিষ্ঠা করার সংবিধিবদ্ধ প্রয়োজনীয়তা ছিল (এস. ৪১ জি, ফাকট্রি অ্যাক্ট, ১৯৪৮), কিন্তু সাম্প্রতিক আইনটি অনুযায়ী তা আর বাধ্যতামূলক নয়। তার পরিবর্তে এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার বিষয়টি, প্রয়োজন অনুসারে, কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের বিবেচনার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে (এস. ২২)।

ভারতের সেমি-কন্ডাক্টর শিল্পের ঘোষিত উন্নতি এমন সময়ে ঘটতে চলেছে, যখন ইতিমধ্যেই অপর্যাপ্ত একটি নিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা নানা বিধিবদ্ধ শর্তের দ্বারা দুর্বলতর হয়ে চলেছে। ভিন্ন ভিন্ন পরিসরের চিপ-উৎপাদনকারী শিল্পের শ্রমিকদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে আমরা বুঝতে পারি যে, এমন "ভাল কাজ" করার জন্য অনুপ্রেরণা দেওয়া উচিত যা তাঁদের স্বাস্থ্যহানির কারণ হয়ে উঠবে না। এর জন্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা ও বিবৃতি দানের আবশ্যিকতার উপর জোর দেওয়ার পাশাপাশি এমন একটি কর্মী-কেন্দ্রিক সাধারণ পরিকাঠামোর প্রয়োজন, যা তাঁদের নিজেদের স্বাস্থ্যের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে ও স্বাস্থ্য নিয়ে তাঁদের উদ্বেগকে গুরুত্ব দিতে সক্ষম করবে।

“সেমি-কন্ডাক্টর নির্মাণ”-কে একটি “বিপজ্জনক” শিল্প হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করার যে সিদ্ধান্ত ভারত নিয়েছে, তা পরোক্ষে স্বীকার করে নেয় যে, এই শিল্প বিপজ্জনক, পেশাগত পরিসরে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় শর্তগুলি পুরনো ও অচল, এবং ক্ষতিকর রাসায়নিক ও প্রক্রিয়ার বিষয়ে তথ্যভাণ্ডার তৈরির জন্য বর্ণনার পদ্ধতিগুলি একেবারেই অকার্যকর। এই শিল্পে রাসায়নিকের ব্যবহার নিয়ে আমরা এতটাই কম জানি যে, কোনও রকম নির্ভরযোগ্য তথ্যের অনুপস্থিতির কারণে ঠিক কতটা রাসায়নিকের ব্যবহার স্বাস্থ্যসম্মত, সে বিষয়ে নিদান দেওয়াও কঠিন হয়ে পড়ে। অন্ততপক্ষে, মানবশরীরের নির্দিষ্ট রাসায়নিকের প্রভাব ঠিক কি তা আগে থেকে পরীক্ষা না করে, চিপ নির্মাণের ক্ষেত্রে ওই রাসায়নিকের ব্যবহার করার অনুমোদন না দেওয়ায়ই উচিত। কর্মীদের স্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে “অনিবার্য ও গুরুতরভাবে বিপজ্জনক” এমন অবস্থা থেকে কর্মীদের নিজেদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অনুমতি দেওয়াও দরকার (অকুপেশনাল হেলথ অ্যান্ড সেফটি সম্পর্কিত আইএলও কনভেনশন নম্বর ১৫৫ অনুযায়ী)। এই শিল্পে পেশাগত ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বজায় রাখার নিয়মগুলিকে দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রযুক্তি, উপাদান ও নির্মাণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে মানিয়ে চলতে হবে। এই ব্যবস্থাগুলিকে শুধু প্রযুক্তির দিক থেকে নির্ভরযোগ্য হলেই হবে না, শ্রমিকদের দিক থেকে উদ্বেগ ও প্রশ্ন যখনই উঠে আসবে, সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিক্রিয়াও এগুলিকে দিতে হবে। সরকারের উচিত, তার দিক থেকে প্রদত্ত অর্থসাহায্যকে এমনভাবে পরিচালিত করা যাতে দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে কাজের পরিসরে স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা বজায় রাখার উন্নতি করা সম্ভব হয়। একমাত্র তাহলেই, আইনকানুন যাতে প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে পর্যাপ্তভাবে তাল মিলিয়ে চলতে পারে, তার উপর বিশেষজ্ঞদের দল ও সংগঠনগুলি কঠোরভাবে নজর রাখতে পারবেন।

জাসুন সেলাত ন্যাশনাল ল স্কুল অফ ইন্ডিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি গবেষণারত।